বলি

সবই শশীবালার কপাল। কলোনির সদ্ ব্রাহ্মণ, যত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মানুষ, সবাই তো পাত পেড়ে হেরম্ববাবুর বাৎসরিক কাজে তৃপ্তি করে আকন্ঠ ভোজন করে এসেছে গতকাল। কারও এতটুকু ইতর বিশেষ হয়নি তাতে। হ'বার কথাও নয়। স্বর্গীয় হেরম্ববাবুর তিন ছেলে কোনও ত্রুটি রাখেনি কোনও বিষয়ে। শুদ্ধ সাত্বিক ব্রাহ্মণ রাঁধুনির হাতে শুদ্ধ সাত্বিক পরিবেশে প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন ভক্ষণে গুরুভোজন-জনিত সাময়িক অসুবিধা ছাড়া আরও গুরুতর পরিণাম ঘটতে পারে, এ কথা কল্পনাও করেনি কেউ। তবু শশীবালার পুর্বজন্মের কোন কৃতকর্মের ফল স্বরূপ, তার বাপ-মরা শিবরাত্তিরের সলতে সদানন্দ গতকালের শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে নিজের শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আনার উপক্রম করলো।

সদানন্দ মানুষটি একটু পেটুক প্রকৃতির, কেতাবী ভাষায় যাকে বলে ভোজনরসিক। জননী শশীবালা এবং পত্নী রেবার প্রশ্রয়ে যত্নে সেই রসিকতা মাত্রাছাড়া বাতিকে পরিণত হয়েছে এমন কথাও বলা চলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি ব্যতিরেকে ....।

রান্নাঘরে ছেলের প্রাতরাশের সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে উৎকন্ঠিত চিত্তে শশীবালা সদানন্দের ঘন ঘন কলতলার পিছনে টিনের শেড দেওয়া ছোট কুঠরি অভিমুখে গাড়ুহাতে অন্তর্ধানের হিসেব কষছিলেন মনে মনে।

অদূরে উবু হয়ে বসে শিলে ছোলার ডাল বাটতে বাটতে রেবা শাশুড়ির দিকে চেয়ে সঙ্কুচিত গলায় বললো, "মোচার ঘন্টে এবেলা আর ডালের বড়া নাই দিলেন মা ....।"

শশীবালা লুচি ভাজছিলেন।

কড়াইয়ের আধভাজা লুচিটাকে ওল্টাতে গিয়ে থমকে থেমে

বললেন, "ওমা, সেকি কথা ! সদু বলে কত শখ করে মোচা কিনে এনেছে ঘন্ট খাবে বলে। ডালের বড়া ছাড়া কি আর মোচার ঘন্ট খোলে !"

রেবা কিছু বললো না, বলার সুযোগও পেলো না। কারণ এই সময় কলঘরের পিছনে টিনের শেড দিয়ে ঢাকা এবং ঘেরা কুঠরি থেকে দড়াম করে পরম রহস্যময় একটা আওয়াজ শোনা গেল। এবং তারপরই চরম নিস্তব্ধতা।

শশীবালা রান্নাঘর থেকে ডাক পাড়লেন, "ও সদু, ও খোকা!"

তারপর খুন্তি হাতে কলঘরের কাছে এসে আবার ডাকলেন, "ওরে ও সদু, কি হ'ল বাপ?"

রেবাও ডালবাটা হাত কাপড়ে মুছতে মুছতে শাশুড়ির পিছনে এসে দাঁড়ালো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। শশীবালা তখন লোকলাজ ভুলে ডিং মেরে টিনের শেডে উঁকি মারছেন। মুহূর্ত খানেক মাত্র।

তারপর খুন্তি ফেলে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, "ওগো আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! ও খোকা, খোকা রে ----।"

টিনের দরজা তার দিয়ে কোনমতে আটকানো। যেমন তেমন একটা হুড়কো দেওয়া তাতে। শাশুড়ি বউয়ের যুগপৎ চেষ্টায় অল্পক্ষণেই দড়াম করে ভেঙে পড়লো সে দরজা। দরজা ভেঙে দু'জনে ধরাধরি করে নিঃসাড় সদানন্দকে বারান্দায় এনে শোওয়ালো। তাদের আর্তনাদ-বিলাপে সচকিত প্রতিবেশীরা ততক্ষণে এসে গেছে অনেকেই। তাদেরই কেউ কলোনির একমাত্র ডাক্তারকে এনে হাজির করলো এবং খানিক পরে তাঁর নির্দেশমত হাসপাতালে খবর পাঠিয়ে অ্যাম্বুলেন্সও ডেকে আনলো তারাই।

কলোনির ছোট্ট হাসপাতাল। নামসর্বস্ব বলতে গেলে। এক ডাক্তার আর অ্যাম্বুলেন্সই আছে শুধু। গুরুতর কিছু বুঝলেই ডাক্তারবাবু অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে রুগীসুদ্ধু সহরের বড় হাসপাতালে চলে যান। সেখানে বড় ডাক্তারের হেফাজতে রুগীকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ন। তবে বড় হাসপাতালে চট করে বেড যোগাড় করা যার-তার কর্ম নয়। তার জন্য ডাক্তারবাবুর সুপারিশ চাই, এবং আর কিছু না হোক এই জন্যেই নাম-

ডাক আছে তাঁর।

সদানন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করে ফিরে এসে ডাক্তারবাবু মুহূর্মুহূ মুর্ছান্বিতা শাশুড়ির পরিচর্যায় নিরত ম্লানমুখী রেবার হাতে কিছু ওষুধপত্তর গুঁজে দিয়ে গম্ভীর মুখে পার্শ্ববর্তীদের লক্ষ্য করে বললেন, "ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি। আর ঘন্টাখানেক দেরী হ'লে কিছু করার থাকতো না। তবে এ যাত্রা টিঁকে যাবেন।"

রেবার উদ্যত কম্পমান হাত থেকে দশ টাকার নোট দুটো নিয়ে উদাত্ত কন্ঠে বললেন, "এ টাকা ড্রাইভার বিষণ দেওয়ের প্রাপ্য। যে স্পীডে অ্যাম্বুলেন্স ছুটিয়ে নিয়ে গেল, রেসের মোটর গাড়িও হার মানে। সদানন্দবাবুর আয়ু ছিল। নইলে এ রোগ কলেরার ভায়রা ভাই; চিকিৎসারও সময় দেয় না। যাক্, এ বড়িগুলো এঁরা দু'জন যেন রোজ তিন বার করে খান ----।"

এঁরা অর্থাৎ শশীবালা আর রেবা। রোগ যার, সে একাই ভোগে না, ভোগে তার আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনরাও। ভোগে দুশ্চিন্তায়-উৎকন্ঠায়-আশঙ্কায়-আতঙ্কে। তাদের জন্যে হাসপাতালে বেড নেই; তবু তাদেরও প্রয়োজন ভেষজের, আশ্বাসের, অভয়ের ----।

- ২ -

ডাক্তারবাবু ফাঁকা ভয় দেখাননি। সত্যিই মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়েছিল সদানন্দ। আবার ফাঁকা সান্ত্বনা বাণীও শোনাননি তিনি। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্য করে সত্যিই ফাঁড়া কাটিয়ে সেরে উঠলো সে। শশীবালা গৃহদেবতার নৈবেদ্য সাজিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের ফল বাতাসা বিলি করে রোগমুক্ত ক্ষীণকায় সদানন্দকে ঘরে তুললেন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে। হাটবারে গয়লার হাতে টাকা গুঁজে দিলেন আগে ভাগে। মিশকালো ছাগলছানা কিনে আনলো গয়লা। নতুন দড়ি দিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে বাঁধা হ'ল তাকে। কিন্তু দড়ি বেঁধেও কি নিশ্চিন্ততা আছে? শিশু মাত্রেরই বুঝি উৎপাত করা স্বভাব। ছাগশিশুও দড়ি টান টান করে রান্নাঘরে ঢুকে জলের মটকা ভাঙে। শশীবালার পাতে মুখ দেয়। একেবারে হেসেলের দরজায় প্রাতঃকৃত্য সারে।

শশীবালা প্রশ্রয়ের সুরে বলেন, "আহা কেষ্টর জীব। ক'দিনই বা।"

উঠোনে বাঁধলে ছাগলটা গোটা তুলসীগাছ খেয়ে হজম করে ফেলে, রোদে দেওয়া বড়ি আচার কাঁথা-বালিস খেয়ে-ফেলে-ছড়িয়ে একাকার করে। শশীবালা যেন দেখেও দেখেন না।

রেবা নালিশ করলে বলেন, "আহা, আর ক'দিন!"

দেখতে দেখতে সে ক'দিনও শেষ হ'ল। অমাবস্যায় মাহালপুরে পুরোনো কালীমন্দির ঘিরে মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তেরা এসে ভিড় করে। ট্রেনে- বাসে-নৌকোয়, রিক্সায়-টাঙায়-হাঁটাপথে পাড়ি দিয়ে। গোছগাছ করে তৈরী হয়ে বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালেন শাশুড়ি বউয়ে। রেবার হাতে বোঝাই থলেতে পুজোর সরঞ্জাম। শশীবালার হাতে ছাগলের দড়ি।

সদানন্দ বাড়িতেই রইলো, প্রতিবেশী পাঁচুগোপালের মায়ের তত্বাবধানে। শরীর এখনও দুর্বল। তাছাড়া নিজের মানতের পুজো নাকি দেখা নিষেধ আছে তার, ঘোর অমঙ্গল হ'তে পারে তাতে। দুই মেয়েছেলে নিজেরাই পুজো দিতে চলেছেন একা একা। পাড়া-প্রতিবেশীকে আর কষ্ট দিতে চাননি। যথেষ্ট করেছেন তাঁরা সদানন্দের অসুখের সময়। এই পুজোটুকু নিজেরাই দিয়ে উঠতে পারবেন। তাছাড়া, এ ক'দিনে যে ভাবে হুড়-হুড় করে গাঁটের কড়ি বেরিয়ে গেছে ওষুধ পথ্যি তত্ব তদারকে, খুব ঘটাপটা করে পুজো করার সাধ বা সাধ্য কোনটাই অবশিষ্ট নেই আর। মাহালপুরের পুজোর বাঁধা ব্যবস্থা আছে সব। যে কেউ গিয়ে সেরে আসতে পারে। শুধু ফর্দ মিলিয়ে জোগাড়-পত্তর করে আনতে হ'বে। বিভিন্ন রেট মাফিক বিভিন্ন ফর্দ আছে। যার যা ক্ষমতা, যার যা অভিরুচি। মাহালপুরে এর আগে একাধিক বার গেছে এরা। সেখানকার নিয়ম-কানুন, ব্যবস্থা-পত্তর জানা আছে ভাল মত। কাঝেই শশীবালা আর রেবা নিজেরাই চলেছে পুজো দিতে, কোন ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা না করে।

কিন্তু গোল বাধালো বাসের কন্ডাক্টার। ছাগলের নাকি টিকিট লাগবে। বিনা পয়সায় চড়তে দেবে না বাসে।

কাণ্ড দেখে শশীবালা গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, সে কি কথা! পুজো দিতে যাচ্ছি। মানসিক করা ছাগলের আবার টিকিট লাগবে

কেন? তবে কি ওই থলেটার জন্যেও টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

পুত্রবধুর হাতে মস্ত চটের থলিটার দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি।

মেড়ো কন্ডাক্টার মাথা নেড়ে বলে, "বড়া আদমী চার রুপিয়া, ছোটা বাচ্চা হাফ টিকিট - দো রুপিয়া। বকরিকা বাচ্চা দো রুপিয়া।"

শশীবালার মুখের সামনে দু'আঙ্গুল দেখিয়ে আবার বলে, "দো রুপিয়া নিকালো।"

রেবা বললো, "দু'টো টাকা দিয়ে দিন মা। বসার জায়গা পাওয়া যাবে না এর পর।"

বসার জায়গা অবশ্য পাওয়া গেল। খুব আরাম করে বসার মত না হলেও। ছাগলছানাটাকে পায়ের কাছে নিয়ে বসলো দু'জনে। খুব বেশী দৌরাত্ম্য করলো না ছাগলটা। থেকে থেকে শশীবালার পায়ে মাথা ঘষতে লাগলো শুধু। তাকে দৌরাত্ম্য বলা চলে না। শিংবিহীন নরম ছাগশিশুর নধর দেহের ঘষানি কষ্টদায়ক নয় মোটেই। অন্তত শশীবালার কষ্ট বা বিরক্তিজনক মনে হ'ল না তা। বরং প্রত্যুত্তরে হালকা হাতে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বোলাতে লাগলেন ছানাটার পিঠে, মাথায়।

মাহালপুরের বাস-স্টপ থেকে কালীমন্দিরের দূরত্ব বড় জোর বিশ পঁচিশ গজ। লোকে লোকারণ্য চতুর্দিক। থরে থরে পুজোর সামগ্রী সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যও রয়েছে। অগণিত খদ্দের, দর্শক, পূজার্থীর ঠেলাঠেলি সর্বত্র। তারই মাঝে পথ করে মন্দিরের পানে এগিয়ে চললো শশীবালা আর রেবা। মন্দিরে লাইন দিয়ে ভক্তেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে পূজার্ঘ নিয়ে। হেড পুরোহিত পুজো বুঝে নিচ্ছেন - নাম, ধাম, গোত্র। দান-পাট এসব অন্য ছুটকো পুরোহিতরা লিস্টি মিলিয়ে গুছিয়ে রাখছে আলাদা করে। যাঁরা বলি এনেছেন - কুমড়ো, লাউ, চাল-কুমড়ো, ফুটি - ঝুড়ি-ভর্তি নামিয়ে দিচ্ছেন এক ধারে। অনেকে আবার ছাগলও এনেছে। নানান সাইজের, নানান ওজনের। তাদের সারি সারি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হচ্ছে। একজন আলাদা পুরোহিত তাদের পরিচর্যা - স্নান, চর্চন, আভরণের জন্য নিযুক্ত আছেন।

শশীবালা ছাগলের দড়ি পুরুতের হাতে দিয়ে পুত্রবধূর হাত থেকে থলি নিয়ে তার থেকে ফুল, মালা, চন্দন, ধূপ, গামছা, চাদর, পিতলের

গেলাস বাটি সব বার করলেন একে একে। ছোকরা মত পুরুত সে সব এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে শশীবালার দেওয়া কাগজখন্ডটি পুজো-সামগ্রীর উপর রাখতে রাখতে বিড় বিড় করে বললো, "শ্রী সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ---- শাণ্ডিল্য গোত্র ---- পিতা ঈশ্বর শ্রী জীবনানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ---- তস্য পিতা ঈশ্বর শ্রী অমুক ----।"

খালি থলিখানা ভাঁজ করে বগলদাবা করে শশীবালা একটু তফাতে এসে দাঁড়ালেন। ওঁদের নম্বর আসতে এখনও ঢের দেরী।

রেবা ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, "দোকান পাটগুলো একটু ঘুরে দেখবেন মা? এই এত বড় বড় পেঁপে দেখলাম। মাহালপুরের পেঁপে যা মিষ্টি !"

পেঁপে শশীবালার অতি প্রিয় ফল।

তাঁর চোখে মুখে ক্ষণিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার, "নিয়ে যাবো কিসে? থলে তো এই একটা বই আর নেই। যা ভিড় হয় বাসে। হাতে করে নিয়ে গেলে সে পেঁপের আর বাড়ি অবধি পৌঁছতে হ'বে না।"

অগত্যা হাটে যাওয়া আর হয় না। ওখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। পুজো শুরু হয়ে গেছে। নিরামিষ পুজোগুলো আগে সেরে নিয়ে তারপর তাঁদের পুজোর পালা। তারও খুব দেরী নেই আর। মন্দিরের চত্বরে একটা বাঁধানো পুকুর মত। বড় চৌবাচ্চাই আসলে। পুরুতমশাই সেখান থেকে ছাগলদের চান করিয়ে আনলেন। টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে জলে ভিজে সিঁটিয়ে যাওয়া শরীর থেকে। শীতে থর থর করে কাঁপছে ছাগলগুলো। নাকি ক্ষণ-পরের পরিণতির আতঙ্কে? রক্তজবার একটা করে মালা পরিয়ে দেওয়া হ'ল ছাগলগুলোর গলায়। পুরুতমশাই মন্ত্র পড়ে উৎসর্গ করলেন একে একে। শশীবালা রেবার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, "বউমা, ওই দ্যাখো কাণ্ড -।"

রেবা দেখলো চারটে ছাগল সিঁটিয়ে রয়েছে। পঞ্চমটি নির্বিকার চিত্তে ঘাড় বেঁকিয়ে মালার জবাফুল খাওয়ার চেষ্টা করছে ক্রমাগত। রেবা চিনলো এ সেই তাদেরই ছানাটা। হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো সে। মালাটা খেয়ে ফেললে আবার মায়ের পুজোয় কোনও খুঁত হয়ে যাবে না তো? তবে তার সে ভয় অহেতুক। গলায় পরা মালাটা বাগে পাওয়ার

আগেই সেটা বাগানোর প্রচেষ্টা থামিয়ে ছাগশিশু করুণ কন্ঠে কঁকিয়ে উঠলো, "ম্যা -।"

সামনের এক নম্বর ছাগলটার মাথা খাঁড়ার এক ঘায়ে ছিট্‌কে পড়েছে তখন। দুই, তিন, চার ----। তারপর রেবাদের ছাগল ছানাও মুহূর্তে দ্বিখণ্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। লাল রক্তের ফিনকিতে ভিজে মালার ফুলগুলো নেতিয়ে পড়লো।

ফেরার পথে সন্ধ্যা নামলো। রোগা ছেলেটা বাড়িতে একা রয়েছে পাঁচু- গোপালের মায়ের ভরসায়। শশীবালা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মনে মনে। রেবার মুখেও উদ্বেগ। কিন্তু করার কিছু নেই। বাস চলছে হেলে দুলে নিজের মর্জি মত। যেখানে সেখানে থামছে নানান অছিলায়। এ বেলা আর ভিড় নেই বাসে। হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে সবাই দু'একটা সিট ছেড়ে ছেড়ে। বাসের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছেন শশীবালা। পায়ের কাছে রাখা ভারী থলিটা বাসের ঝাঁকানিতে বারে বারে ওদের পায়ে ঠেলা দিচ্ছে, যেন ওদের পায়ে মাথা ঘষছে কেউ।

মেড়ো কন্ডাক্টার টিকিট দিতে দিতে ওঁদের কাছে এসে দাঁড়ালো, "কয়ঠো টিকিট, মাইজী?"

শশীবালা চিনলেন এ সেই লোকটাই যে যাবার সময় তাঁকে ছাগলের টিকিট কাটিয়ে ছেড়েছিল।

মনের ঝাল ঝাড়ার জন্যে বললেন, "এবার শুধু দো বড়া আদমী। ছাগলের বাচ্চা ওই থলির মধ্যে। ওটার জন্যে এবেলাও দো রুপিয়া লাগবে নাকি?"

কন্ডাক্টার থলির মধ্যে উঁকি দিয়ে শশীবালার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলো। বাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সে হাসির প্রতিধ্বনি উঠলো বয়স্কা মাইজির এই সরস রসিকতায় ----।